সাহেবি খানা

মনিরা বেগম

লিইবার ফিয়েরা

https://lfbooksindia.com

An LF Books India Production

Sahebi Khana
Collection of recipes of continental and anglo indian dishes
Written by Monira Begum

First Edition **5th April 2025**
Volume No. I Hardbound
ISBN 978-93-93629-76-0
Copyright © Monira Begum

Printed at
PRINT-O-PROCESS
15/5, K.B. Sarani, Mall Road, Dum Dum, Kolkata 700080

Published by
LIBER FIERI
C/O Debnath House, Kabi Sukanta Road,
Nabapally, Barasat, Kolkata 700126

Cover Artist Debasish Saha
Book Editing Apurba Kumar Pal
Book Design Arup Ghatak

ALL RIGHTS RESERVED. No part of this book may be sold in any manner whatsoever and/or reproduced and transmitted in any form by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording or by any information storage and retrieval system, except as may be expressly permitted in writing by the publisher.

All communication at liberfieri@gmail.com

INR: 299.00 | US$: 7

ওয়াইডব্লিউসিএ, কলকাতার প্রাক্তন এক্সেকিউটিভ ডিরেক্টর
ও বর্তমানে প্রয়াত আমার খুবই শ্রদ্ধেয় দুই ম্যাডাম
শীলা পি. জেকব ও নীতা দাসের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে
আর যাঁরা এই সংস্থায় আমার সহকর্মী আছেন ও ছিলেন
সবাইকে খুব ভালোবেসে ও সম্মানের সঙ্গে
আমার এই বিনম্র নিবেদন

ভূমিকা

ভারতে ব্রিটিশ আসার প্রথম দিকে আঠারো-উনিশ শতকে, কিছু বিচিত্র খাদ্যের প্রবেশ ঘটে এ দেশে। তার কয়েকটি উদাহরণ, কেহজুরি (খিচুড়ি, ইংরেজি বানান kedgeree), পিশ-প্যাশ (এক ধরনের মাংসের খিচুড়ি, pish-pash) এবং মালাগাটনি সুপ (দক্ষিণ ভারতীয় প্রভাবে তৈরি, mulligatawny soup)।

উনিশ শতকের ইংরেজ সৈনিক কর্নেল এ আর কেনি-হারবার্টের লেখা কয়েকটি রান্নার বইও আছে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান খাবার বিষয়ক। তিনি এক অদ্ভুত উপনাম ব্যবহার করতেন ওয়াইভার্ন, যা এক ড্রাগন জাতীয় প্রাণী। ব্রিটিশ মেমসাহেবদের জন্য বইগুলি লিখেছিলেন যাতে তাঁরা নিজেদের উপযোগী খাবার তৈরি করতে ভারতীয় বাবুর্চিদের পরামর্শ দিতে পারেন। গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে জেনিফার ব্রেনান এবং ডেভিড বার্টন, এঁরাও এই দো-আঁশলা রান্না নিয়ে বই লিখে খ্যাতি পেয়েছেন।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনকালে ইংরেজ রাজকর্মচারীরা ভারতীয় রান্নার সঙ্গে নিজেদের দেশীয় রান্না মিশিয়ে সৃষ্টি করেন নানা বাহারি নামের রান্না। যেমন, রেলওয়ে মাটন কারি, ডাকবাংলো চিকেন কারি, ব্যাড ওয়ার্ড কারি, জাঙ্গলি পোলাও, মাটন পানথেরাস, ক্যালকাটা ফিশ কাটলেট, অ্যাপল চাটনি ও আরও অনেক কিছু।

এর মধ্যে ১৮১০ সালে লন্ডনে খুলেছে শেখ দিন মোহাম্মদের মালিকানায় প্রথম ভারতীয় রেস্তোরাঁ দি ইন্ডিয়ান কফি হাউস। ১৮১৫ সালে প্রকাশিত এপিকিউর্স আলমানাক লন্ডনের সেরা ভোজনালয়গুলির মধ্যে রেখেছে তাকেও।

বর্ণনামতো কারি পাউডার, গোলমরিচ এবং আরবের সেরা মশলা দিয়ে সেখানকার খাবার তৈরি হত। পাশে একটা কামরা ছিল সুবাসিত হুঁকো টানার জন্য। হ্যান গ্লাসের লেখা মধ্য-আঠারো শতকের বই দি আর্ট অফ কুকারি-সহ পরবর্তী সময়ে এই ধরনের আরও কিছু রান্নার বই বেরোতে শুরু হওয়ার পর ইংরেজ হেঁশেলেও ভারতীয় স্টাইলে খাবার রান্না চালু হয়ে যায়।

অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান রান্নায় স্পষ্টই ব্রিটিশ প্রভাব ছিল, সেইসঙ্গে ওলন্দাজ, পোর্তুগিজ, ফরাসি ছোঁয়াও অল্পবিস্তর। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের একটা প্রিয় পদ

প্যানথেরাস, যা জলখাবার এবং দুপুর বা রাতের খাবার, দু'ভাবেই খাওয়া চলে।

অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের কিছু মূল্যবান সঞ্চিত রন্ধনপ্রণালী আছে, বংশপরম্পরায় যা চলে আসছে। যেমন নারকেল দেওয়া হলুদ রঙা ভাত এবং ব্যাড ওয়ার্ড কারি, এই অদ্ভুত নামের টমেটো গ্রেভিতে রান্না করা মাংসের কোফতা।

আর একটা নাম মনে আসছে ভিন্ডালু, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান খাবার হিসেবে জনপ্রিয় হলেও ভারতে এই খাবার চালু করেছে পোর্তুগিজ নাবিকরা, ব্রিটিশরা তাদের কাছ থেকেই শিখেছে। পোর্তুগিজদের মাংস সংরক্ষণের নিজেদের পদ্ধতি ছিল ওয়াইন বা ভিনিগার দিয়ে, তা থেকেই এসেছে এই রান্নার প্রণালী। ঝালফ্রেজি আর-এক জনপ্রিয় অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান রান্না। নাম দেখেই বোঝা যায়, ঝাল এবং মশলাদার এই রান্নায় মাংস ও সবজি দুইই থাকে।

কলকাতা এমন এক শহর যার বিভিন্ন অংশে বহু অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পরিবার বহু শতাব্দী ধরে বাস করত। এর মধ্যে একটা হল মধ্য কলকাতার ঐতিহ্যময় বো বারাক, যেখানে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সৈন্যদের রাখা হয়েছিল। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বসতি ছিল আরও কয়েকটা জায়গায়, যেমন খিদিরপুরের বিএনআর রেল কোয়ার্টার, নারকেলডাঙা রেল কলোনি। পরে তারা ছড়িয়ে পড়ে পার্ক সার্কাস, ম্যাকলাউড স্ট্রিট, এলিয়ট রোড, রিপন স্ট্রিট, এরকম আরও কিছু কিছু জায়গায়।

কলকাতায় অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের সংখ্যা কমতে শুরু করল সত্তর ও আশির দশকে যখন অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ড তাদের জন্য দ্বার খুলে দেয় আর তারাও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভেবে সে সুযোগ গ্রহণ করতে এগিয়ে যায়। কলকাতার ঐতিহ্য অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান খাবারও এর ফলে হারিয়ে যেতে থাকে। তবে সোশ্যাল মিডিয়া এবং ইন্টারনেটের কল্যাণে এই রন্ধনশৈলী আবার নতুন করে প্রচার পেতে শুরু করেছে।

অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের কথা বলতে গিয়ে তাদের উপর ব্রিটিশ প্রভাবের আর-একটা দিক বাদ দিলে চলবে না। সেটা হল ক্রিসমাস মহোৎসবের আনন্দ দ্যা ডালহৌসি ইনস্টিটিউট, রেঞ্জার্স ক্লাব ইত্যাদি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পরিচালিত ক্লাবে সারা রাত গানবাজনা ও নাচ।

আর অবশ্যই, ক্রিসমাস প্লাম পুডিং এবং রোজ কুকি ছাড়া অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বাড়ির ক্রিসমাস উৎসব পালন অসম্পূর্ণ। তা ছাড়া কেক তো ক্রিসমাসে থাকবেই। প্রত্যেক পরিবারের আছে কেক তৈরির নিজস্ব প্রণালী। কোনো কারণে নিজেরা না করতে পারলে নিউ মার্কেটের নাহুম তো রয়েছেই। আজও নাহুমে ক্রিসমাসের সময় কেক কেনার লাইন পড়ে।

লেখিকা মনিরা বেগম শুধু অ্যাংলো-ইন্ডিয়া রান্না নিয়ে লেখেননি, সঙ্গে যোগ করেছেন কন্টিনেন্টাল আহারও। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রান্না। কলকাতায় এখন ক্যাফে, রেস্তোরাঁ, এমনকি ইউরোপের অনুসরণে বিস্ট্রো, এসব হয়েছে। মাল্টিকুইজিনের স্বাদ নিতে চাইছে মানুষ। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে মানুষ খুব সাহসী হয়ে উঠেছে, বিভিন্ন স্বাদ ও সাধ্য অনুযায়ী দেশবিদেশের খাবারও শহরে ক্রমশ সুলভ হচ্ছে।

আর সেটা যদি বাড়িতে নিজেরাই তৈরি করা যায় তা হলে তো কথাই নেই। সেই ব্যবস্থাই লেখিকা মনিরা বেগম করে দিয়েছেন বইটি লিখে। যথার্থ নাম হয়েছে সাহেবি খানা। একবার রান্নাগুলির তালিকা দেখলেই আন্দাজ করা যায় কী পরিমাণ গবেষণা আছে এর পিছনে। তবে ওঁকে আমি বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানাব, কারণ অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান খাদ্য-ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রাখতে ওঁর এই প্রয়াস সহায়ক হতে পারে।

কলকাতার ইয়ং উওমেন্স ক্রিস্টিয়ান আসোসিয়েশনে কবে সেই জুলাই ১৯৯২ থেকে নানা পদ্ধতির রান্না ও বেক করা শেখাচ্ছেন তিনি, আর তারই সূত্রে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান এবং ইউরোপীয় রান্নার প্রতি তাঁর আকর্ষণ ও এই সম্পর্কে চর্চা। ফলে, এ নিজ বিষয়ে এক প্রামাণ্য গ্রন্থ হয়ে উঠেছে। খাদ্যরসিক বা যাঁদের নানারকম রান্নার শখ, এমনকি পেশাদারদেরও কাজের বই হবে এটি বলে আমার বিশ্বাস।

ট্রয় স্মিথ
প্রাক্তন সচিব, ওয়াই. ডব্লিউ. সি. এ., কলকাতা

মূল ইংরেজি থেকে অনুবাদ।

সূত্রপাত

অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান রন্ধনশৈলী

ভারতে উপনিবেশ স্থাপনের পর দীর্ঘ সময় ধরে শাসন করার সূত্রে ইংরেজ এ দেশে বাস করেছে। সেই সময়ে কিছু শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ভারতীয় নারীর সঙ্গে সংসারও পাতেন। ইংরেজ বাবা ও দেশীয় মায়ের সন্তানেরা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বলে পরিচিত। অধিকাংশই ফরসা, ইংরেজি বলা এই ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী ভারতের সামাজিক মানচিত্রে স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছিলেন, পরে যদিও তাঁদের অনেকেই যে যেমন সুযোগ পেয়েছেন ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া-আমেরিকায় গিয়ে স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছেন। সবাই যে গেছেন তা নয়, কেউ কেউ থেকেও গেছেন এবং তাঁরা আজ ভারতীয় জীবনধারারই অংশ ও আমাদের সহ-নাগরিক।

যেহেতু ১৯১১ সাল পর্যন্ত কলকাতা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী ছিল, স্বাধীনতার পরেও অনেকদিন পর্যন্ত পরিপাটি পোশাক পরা সপ্রতিভ চেহারার অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের এই শহরেই বেশি দেখা যেত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, খেলার ময়দান, গানবাজনা এবং সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে এককালে তাঁদের যে নজরে পড়ার মতো উপস্থিতি ছিল তা আজ ক্রমে ক্ষীণ হয়ে এলেও, অনুভব করা যায়।

ভারতীয় সমাজে তাঁদের প্রভাবের যে দিকটা নিয়ে চর্চা তুলনামূলক ভাবে কম, সেটা হল খাদ্য। ভাষার মতো রন্ধনশালা এবং খাবার টেবিলে চতুর্দিক থেকে প্রভাব এসে পড়ে কিন্তু এক নজরে চেনা যায় না কোত্থেকে কী এসেছে? তবে কিছু স্বাক্ষর বহনকারী রান্না থাকে, যেমন মোগলাই বা চাইনিজ। অতটা না হলেও অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান কুইজিন অর্থাৎ তাঁদের নিজস্ব রন্ধনপ্রণালীকে একটা আলাদা শ্রেণি হিসেবে মেনে নিতে আপত্তি হওয়ার কথা নয় এবং বাস্তবিক, এ ভাবেই তা স্বীকৃত। তবে যেহেতু এ বিষয়ে আলোচনা কম, তাই আমার মনে হয়েছে, এ জাতীয় বই, আমি করি বা যিনিই করুন, তার দরকার আছে। রন্ধনপুস্তক তো আজকাল শুধু রেসিপি সংগ্রহই নয়, সংস্কৃতিচর্চারও অঙ্গ। আমার লেখা সব বইয়ে আমি সেভাবেই রান্নাকে উপস্থাপন করতে চেয়েছি। সেইসঙ্গে সীমিত পরিসরের মধ্যে আনুষঙ্গিক ইতিহাসও তুলে আনার চেষ্টা করি।

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রশাসক হিসেবে জোব চার্নক ভারতে

আসেন সতেরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধের গোড়ায়। অনেক ঘাটের জল খেয়ে অবশেষে কলকাতায় ডেরা বাঁধেন মৃত্যুর তিন বছর আগে ১৬৯০ সালে। তাঁর আসার আগে, আকবর বাদশার সময়েও কলিকাতা ছিল। এমনকি, তারও আগে বিপ্রদাস পিপলাইয়ের কাব্য মনসামঙ্গলে এই নামে গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং, চার্নক না কলকাতার আবিষ্কারক, না নির্মাতা। তবে উপনিবেশ স্থাপনকারী নিশ্চয়। সেই পর্বে কীভাবে, 'বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী রাজদণ্ডরূপে', এ ইতিহাস অল্পবিস্তর সকলেরই জানা।

পলাশি যুদ্ধের পরে যখন পরোক্ষ ক্ষমতা কোম্পানির হাতে, ইংল্যান্ড থেকে আসা ঔপনিবেশিকরা প্রথমদিকে যেমন ভারতীয় মহিলাদের নিয়ে সংসার পেতেছেন, তেমনি আবার ইউরোপ থেকে পরে শ্বেতাঙ্গ মহিলাদের আগমন শুরু হওয়ায় অনেকে স্বদেশীয় জীবনসঙ্গী পেয়ে যান। শ্বেতাঙ্গ পরিবারে ভারতীয় আয়া ছিল অপরিহার্য। আয়ারা অনেকে ছিলেন মিশ্র রক্তের ইউরোপীয় পিতা এবং ভারতীয় মায়ের সন্তান। ভারতে বসবাস এবং স্থানীয় সংসর্গ ও স্থানীয় উপকরণের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে অল্পস্বল্প হলেও ইংরেজ রসনা এবং খাদ্যরীতিতে পরিবর্তন আসতে শুরু করে। ইউরোপীয় এবং ভারতীয় খাদ্যপ্রণালী পুরোপুরি আলাদা হলেও, শারীরিক ও সাংস্কৃতিক নৈকট্যের ফলে দুই ধারার মধ্যে ঠোকাঠুকি যেমন ছোঁয়াছুঁয়িও তেমন অনিবার্য ছিল এই পরিস্থিতিতে। ভারতীয় মশলাদার খাবার ইউরোপীয় রসনায় অসহ্য, যদিও অনেকদিন থেকেই ব্রিটেনে ভারতের কারি শ্বেতাঙ্গদেরও একাংশের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছে।

ভারতে থাকাকালে অতীতে তাঁরা নিজেরাও ব্রিটিশ খাবারের সঙ্গে পছন্দসই ভারতীয় মশলা যোগ করে নতুন স্বাদ আনার চেষ্টা করেছিলেন। যেমন, মাংসের স্টু, রোস্ট যেগুলি ব্রিটিশ ট্র্যাডিশনাল খাবার, তাতে এ জাতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছিল। ব্রিটিশ অফিসারদের ভারতীয় খানসামারা প্রভুদের রসনার উপযোগী করে নানারকম নতুন পদ উদ্ভাবন করতেও সচেষ্ট ছিলেন। যেগুলো ব্রিটিশ খাবারের মতো স্বাদহীন নয় আবার ভারতীয় খাবারের মতো খুব মশলাদারও নয়। এইভাবেই ক্রমে গড়ে ওঠে এক অনন্য অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান খাদ্যশৈলী। মনে হয় ওটাই, আধুনিক অর্থে ফিউশন ফুড বলতে যা বোঝায় তার প্রথম ভারতীয় নিদর্শন।

এ দেশে ব্রিটিশ শাসনের প্রসার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুধু বাংলা নয়, আলাদা আলাদা অঞ্চল বিশেষে সেখানকার খাবার ও মশলার প্রভাব পড়তে থাকে ব্রিটিশ রন্ধন পদ্ধতির ওপর। উদাহরণস্বরূপ, খুবই পরিচিত মালাগাটনি সুপ— এই নামের উৎস তামিল শব্দ মিলাগুতন্নি, যার অর্থ মরিচ-জল। এ হল এক প্রকার পেপার ব্রথ (Pepper Broth), তামিল রসম থেকে অনুপ্রাণিত। খাবারে নারকেলের দুধের ব্যবহারও দক্ষিণের প্রভাবে। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান রান্নাঘরে মাদ্রাজ মশলা